যুগশঙ্খ SUPPLI

কলকাতা

সোমবার, ১৫ মে ২০১৭

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

স্যার উইলিয়াম এমারসনের সৌকর্যের ছোঁয়ায় অনন্য রূপ নিয়ে প্রাসাদনগরীর বুকে দাঁড়িয়ে আছে রানি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি বহনকারী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। প্রশস্ত ও মনোরম বাগান, বাগানের সুন্দর সুন্দর গাছ ও ফুলগুলো ভিক্টোরিয়ার সৌন্দর্যের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে। পবিত্রতার প্রতীক, সুন্দরের প্রতীক ফুল। তবে এই বাগান, মাঠ আর পুকুরের পাড়গুলোয় কাপলদের অশালীন প্রেমালাপে সেখানে প্রাণ খুলে ঘুরে বেড়ানো দায়। তাই পবিত্র ফুলের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক দেখে নেওয়া প্রিয় ভিক্টোরিয়াকে।

ফোটো: **সৌরভ সরকার** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

মনোময় ভট্টাচার্য (সংগীতশিল্পী)

কলকাতায় আমার জন্ম। তারপর থেকেই কলকাতার সঙ্গে একটু একটু করে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আমার বড় হওয়া, পড়াশোনা, গানের জগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া— সবকিছুই তো কলকাতায়। গানের প্রোগ্রামের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু কলকাতার মতো এরকম প্রাণের শহর আমি আর কোথাও দেখিনি। এখানকার এত উচ্ছলতা, উন্মাদনা আমাকে খুব টানে। শুধু তো গান-বাজনা নয়— সিনেমা, নাটক, থিয়েটার সবকিছুরই মেলবন্ধন রয়েছে কলকাতায়। আর তাই কলকাতা আমার খুব প্রিয় একটা শহর।

গত কয়েক বছরে কলকাতার বেশ উন্নতি হয়েছে। রাস্তাঘাট অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছে। তবে উন্নতিটাই সব নয়, মানুষকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। কলকাতায় দিন-দিন লোকসংখ্যা বাড়ছে, গাড়ির সংখ্যাও বাড়ছে, কিন্তু কিছু কিছু মানুষকে দেখি সিগন্যাল না মেনে রাস্তা পার হচ্ছেন, বাইক বা অটো চালকরা যেখান-সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ছেন। কলকাতায় আলোর ব্যবস্থা এত সুন্দর হয়েছে, এই আলোও অনেককে খুলে নিতে দেখি!

আর একটা কথা বলব কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থাটা একটু উন্নতি হলে ভালো লাগবে। বিদেশ থেকে যখন ফিরি তখন ভাবি এত কনজেস্টেড, এত পলিউশন। এগুলোর দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হয়।

আমার মনে হয় অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতা কিছুটা হলেও সেফ। তবে, এখন একটা মেয়ে যদি রাত এগারোটার সময় একা রাস্তা দিয়ে আসে তাহলে তার যে কোনও রকম বিপদ হতে পারে, তাই উপযুক্ত নিরাপত্তা নিয়েই বেরোনো উচিত। পাশাপাশি আশপাশের মানুষকে বদলাতে হবে, তাদের মানসিকতারও পরিবর্তন করতে হবে।

সবশেষে একটাই কথা বলব শহরটাকে আরও বেশি সুন্দর করতে হলে মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে, তাকে আরও বেশি সাবধান হতে হবে, শুধু নিয়ম করলে হবে না। আমরা যেমন বাবা-মাকে ভালোবাসি তেমনি শহরটাকেও ভালোবাসতে হবে। কলকাতার একটা জিনিস খেতে আমার খুব ভালো লাগে সেটা হল জিলিপি...

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

‘হকার না আমাদের বন্ধু’

রাহুল দে

‘চায়ে...চায়ে গরম...চায়ে...’ আওয়াজটা কানে আসতেই দেখলাম, সেই একইরকম ফিল্মিস্টাইলে এন্ট্রি নিল লোকটা। তবে না এটা শ্যামাদা নয়। হঠাৎই শ্যামাদার মুখটা ভেসে উঠল। প্রতিদিন ট্রেনে যেতে-যেতে সম্পর্কগুলো কেমন একা একাই তৈরি হয়ে যায়। আসলে যাদের কাছে অফিস মানেই স্ট্রেস, তাদের কাছে এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ট্রেনজার্নি সারাদিনের অফুরন্ত অক্সিজেনের জোগান।

বছর চারেক আগের কথা, তখন সবেমাত্র ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করেছি। শ্যামাদার চা ছাড়া আমাদের তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টের আড্ডার আমেজটাই আসত না। আসলে শ্যামাদা মানেই একটা কমপ্লিট এন্টারটেনমেন্ট প্যাকেজ। কখনও কখনও শ্যামাদাকে নিয়ে কথাবার্তার এমন পর্যায়ে চলে যেত যে নতুন কারোর পক্ষে হজম করা একটু কষ্ট করছিল। এই ননভেজ আলাপ-আলোচনা না নিতে পেরে বসাকবাবু সবসময় কানে ইয়ারফোন গুঁজে বসে থাকতেন জানলার পাশের সিটটাতে।

অন্যদিনের মত এদিক-ওদিক ধাক্কাধাক্কি করে চেনা প্যারালাল সিটদুটোর মাঝখানে গিয়ে একদিক ঘুরে দাঁড়ালাম। কম্পার্টমেন্টের সবার আলোচনায় বারবার উঠে আসছিল শ্যামাদার কথা। গত দু’দিন শ্যামাদা আসেনি। আজ শ্যামাদা উঠল। সেই চেনা ডাক। তবে ডাকটা কেমন যেন অচেনা লাগছিল। গলার আওয়াজে মনে হচ্ছিল সেই চার্মিং অ্যাংরি ব্যাপারটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। দু-চারজন ইয়ার্কি করতে শুরু করেছে শ্যামাদার সাথে, কি দিনদুই কইছিলা?...’ শ্যামাদাও হাসছে তবে হাসির জৌলুশে কিছু একটা খামতি আছে। পুরো কম্পার্টমেন্টের সবাই সেটা ফিল করল। পরেরদিন তাকে আরও বিধ্বস্ত লাগছিল। অনেক চাপাচাপির পর জানা গেল তার মেয়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সারাদিন মজা-হাসি-ঠাট্টায় ডুবে থাকা লোকটার দু’চোখের কোনায় জলের রেখা দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। শ্যামাদা বলে, আমি সামান্য হকার, কী

করে যে মেয়েটাকে বাঁচাব...’।

হঠাৎ বসাকবাবু জানালার পাশ থেকে বলে উঠলেন, ‘তুমি হকার না আমাদের বন্ধু। চিন্তা কোরো না সব ঠিক হয়ে যাবে।’ সবাই যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী হেল্প করার চেষ্টা করল। আমিও সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে দাঁড়ালাম। তবে এই সাহায্য নিতে চাইল না শ্যামাদা। শেষমেশ অনেক জোরাজুরিতে নিল, তবে ধার হিসেবে।

তারপর আমি বদলি হয়ে চলে আসি মেনলাইনে। হঠাৎ একদিন কোথা থেকে নম্বর জোগাড় করে আমাকে ফোন করেছিল শ্যামাদা, সেই টাকাটা ফেরত দেবার জন্য। বলেছিলাম সময় মত নিয়ে নেব কখনও তো দেখা হবে নিশ্চয়ই। কত স্মৃতি, কত ঘটনা কত অচেনা মুখের চেনা হয়ে ওঠা। এই নিয়েই তো ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের জীবন।

কলকাতা

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১৫ মে ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

প্রিয় 'যুগশঙ্খ সাপ্লি'র পাঠক আপনারা ওয়েবসাইটের 'রিডার্স কমেন্ট'-এ কিংবা ই-মেইলে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত লিখে জানাচ্ছেন। আমরা ভীষণ খুশি। আমরা আপনাদের মতামত থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছি এবং আপনাদের চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।

আপনাদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ, আপনারা যাঁরা 'সাপ্লি' সংক্রান্ত মতামত জানাচ্ছেন,তাঁরা দয়া করে তাঁদের ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর জানাবেন। কারণ, আমরা আপনাদের সঙ্গে সরাসরি কথাও বলতে চাই। *(সাপ্লি টিম)*

প্রিয় বন্ধু @ কলকাতা

কবির শহর

বীথি চট্টোপাধ্যায় (লেখিকা)

তখন আমার জন্ম হতে অনেক অনেক বছর দেরি। তখন কলকাতায় রাতে ডাকত শিয়াল, শহরে চলত ঘোড়ায় টানা গাড়ি , চিনে সিঁদুরওলা ঘুরত নিস্তব্ধ দুপুরে। তখন কলকাতায় কত বড় বড় মহীরুহ, জলাশয়। গরমকালে টানা পাখার দরকারই পড়ে না বেশিরভাগ বাড়িতে। দিনের আলো মুছে গেলে ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে প্রদীপ, হ্যাজাক, লণ্ঠন। রাস্তায় জ্বলে গ্যাসের বাতি। সন্ধেবেলায় গা ধুয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছাদে গিয়ে বসেন নতুন বউঠান কাদম্বরীদেবী। তাঁর সামনে বরফে ঠান্ডা করা তালশাঁস, জুঁই ফুলের গোড়ের মালা, তাঁর কনিষ্ঠ দেবর শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সামনে বসে বসে কখনও পড়ে শোনান নতুন লেখা কবিতা, কখনও ধরেন সদ্য সুর করা গান। একটা ফিনফিনে চাদর উড়িয়ে, হাতে রুপো বাঁধানো ছড়ি নিয়ে এসে হাজির হন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। রবির দাদা। অন্ধকার ছাদে হ্যাজাক জ্বেলে দিয়ে যায় ভৃত্যরা। জ্যোতিরিন্দ্র মহামূল্য ব্রান্ডির বোতল থেকে গ্লাসে পানীয় ঢালেন। স্বর্গের সুরসভার থেকেও বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে জোড়াসাঁকোর ছাদ-বারান্দা। পরদিন ভোরের আলো ফোটবার আগেই জেগে ওঠে ঠাকুরবাড়ি। অবশ্য শুধুই ভৃত্যদের ঘুম ভাঙে। বাড়ির আর কেউ জাগে না। শুধু রবীন্দ্রর পিতা দেবেন্দ্রনাথ উঠে পড়েন ভোরের আলো ফুটবার আগে আগেই। তিনি কিছুদিন ধরে যেন কোনও বৈদিক ঋষির মতো জীবনযাপন করছেন। নিজের জীবনকে তিনি করে তুলেছেন নিপাট অনাড়ম্বর। ভৃত্যরা রুটির ওপর মাখন দিয়ে সেঁকতে বসে যায়। বাজারে যাবার তোড়জোড় শুরু হয়। রবির পিঠোপিঠি দাদা সোমেন্দ্রনাথ এক ঝুড়ি বিস্কুট আর এক কলসি দুধ নিয়ে ঠাকুর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ান। সারা পাড়ার কুকুর বিড়ালরা ছুটে আসে রবির সোমদাদার সামনে। একটি বিড়ালের পা ভাঙা। সে মুমূর্ষু, হাঁটতে পারছে না। দুর থেকে মিউমিউ করছে। সোমদাদা দৌড়ে গিয়ে বেড়ালটাকে কোলে তুলে নেন। তারপর ডাক দেন রবি... ওই রবি, শিগগির আয়, দ্যাখ বেড়াল ছানাটার পা ভাঙা। রবীন্দ্র ছুটে আসে। সেকি কোনটার পা ভাঙল? রবীন্দ্র মুমূর্ষু বিড়ালটিকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। ওষুধ দেয়। কাদম্বরী চোখ পাকিয়ে বলেন— আবার একটাকে আনলে রবি? তুমি তো সবসময় থাকবে না। সেই তো আমাকে দেখতে হবে রোজ। আমার ওপর আরও কত কী দায় চাপাবে বলো দেখি? রবি প্রতিবাদ করে। বউঠান, একে সোমদাদা এনেছে। আমি বহু বারণ করেছিলুম, বলেছিলুম বউঠান রাগ করবে, সোমদাদা তবু দিয়ে গেল, কোনও কথা শুনলেনে। কাদম্বরী রবিকে থামিয়ে দিলেন। থাক। সকালবেলায় এত মিথ্যে কথা বলতে হবে না। আহারে দুধের শিশু। আয় আয় চু চু। জ্যোতিদাদা রবির ঘরে উঁকি দিয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে যান। কাশ্মীরি কাজ করা পাঞ্জাবি আর তসরের জরিপাড় ধুতিতে কী সুন্দর দেখাচ্ছে জ্যোতিদাদাকে। রবি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে।

কলকাতার দক্ষিণে গাছপালাঘেরা বিরাট একটা বাড়ি ভাড়া করে ঠাকুর বাড়ি থেকে আলাদা থাকছেন রবির মেজো বউঠান জ্ঞানদানন্দিনী। তাঁর স্বামী থাকেন দূর প্রবাসে। সত্যেন্দ্রনাথ ভারতের প্রথম আইসিএস। তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী নিজের শিশুকন্যা, শিশুপুত্রকে নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার শুনশান এলাকায় একা থাকেন। যদিও কাজের লোক থাকে। কিন্তু বাবা, স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতি কোনও পুরুষ অভিভাবক ছাড়া কোনও ভদ্রবাড়ির বঙ্গনারী শহরে একা বসবাস করছে এই ঘটনা কলতাতায় তখন অভাবনীয় । কলকাতার এলিট সোসাইটিতে তখন কানাকানি। সকলে বলছে এটা ঠাকুরবাড়ির পক্ষেই সম্ভব। ভদ্রঘরের কোনও বাঙালি যুবতী মেয়ে দুটি বাচ্চা নিয়ে একা থাকছে। তার শ্বশুরবাড়িতে থাকার এলাহি জায়গা সত্ত্বেও সে

থাকছে আলাদা বাড়িতে— এমন অদ্ভুত ঘটনা কলকাতা শহর সেই প্রথম দেখছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আকাশ হঠাৎ কালো হয়ে আসে, হু হু করে বাতাস বইতে শুরু করে। আজ জ্ঞানদানন্দিনী রবিকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর দক্ষিণের বাড়িতে। জ্যোতিদাদাও রাতে ওখানেই খাবেন। নতুন বউঠান যাবেন না। রবির দুই বউঠানের ভিতর পরস্পর একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব রয়েছে। কাদম্বরী একা একা বসে থাকবেন জোড়াসাঁকোর প্রকাণ্ড মহলে। হাওয়া এসে নিভিয়ে দেবে প্রদীপ। জ্ঞানদানন্দিনীর বাড়িতে তখন উঠবে খুশির তুফান। জ্যোতিদাদা পানীয় নিয়ে বসবেন। রবিকে সবার পীড়াপীড়িতে মজার মজার গান করতে হবে; নাহলে পার্টি জমবে না। কোনও বঙ্গললনা একা একা বাড়িতে পার্টি দিচ্ছে এটাও সেই প্রথম দেখল কলকাতা শহর। জ্ঞানদানন্দিনীর বাড়িটা যেন কলকাতার বুকে একটুকরো লন্ডন। ওয়াইনের গ্লাসে গ্লাসে টুংটাং শব্দ ওঠে। নারী-পুরুষ পরস্পর সাবলীল গল্প করে। রবির এই মুক্ত পরিবেশ ভালো লাগে।

রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী ঠাকুরবাড়িতেও অনেক নতুন নতুন বিপ্লব করেছেন। স্বর্ণকুমারীর রূপের জৌলুস পূর্ণ চন্দ্রকে ম্লান করে দিতে পারে কিন্তু রূপ নয় স্বর্ণকুমারীর অহংকার তাঁর নিজের জ্ঞান নিয়ে। ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত, আরবি ভাষা ছাড়াও সাহিত্য, গণিত ও পদার্থবিদ্যায় সুপণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের এই দিদিটি। শুধু মেয়েদের নিয়ে তিনি একটা আড্ডা বসান প্রতিমাসে। শাড়ি গয়নার আলোচনা বা পরচর্চা সেখানে হয় না। যে কোনও সামাজিক রাজনৈতিক কাজের সমালোচনা হয়, সাহিত্য আলোচনা হয় স্বর্ণকুমারীর সেই আসরে। মেয়েদের সংসারের পরিমণ্ডলের বাইরে কিছু করবার একটা মঞ্চ তৈরি করতে চান স্বর্ণকুমারী।

বাঙালি মেয়েদের লেখবার, রাজনীতি করবার প্রেরণা জোগান রবির বিদুষী দিদিটি। জ্ঞানদানন্দিনী কলকাতার বাঙালি সমাজকে একটা সুস্থ ভোগবাদের রাস্তা দেখান। তিনি তাঁর জীবনযাপনে বলতে চান আমোদ-প্রমোদ মানেই বেলাল্লা নয়। মদ্যপান করলেই মাতাল হয়ে ভুলভাল বকতে হবে তাও নয়। একটা বিলিতি কালচার তিনি নিজের কলকাতার বাড়িতে গড়ে তুলছেন।

কাদম্বরী এসব কিছুই করেন না। তিনি ঠাকুরবাড়ির গাছে জল দেন, মাতৃহারা রবিকে রেঁধে খাওয়ান, রবির কবিতা শোনেন। সকালে ভিস্তিওলা রাস্তা ধুয়ে দিয়ে যায়, সন্ধেবেলা গ্যাসের বাতি জ্বলে টিমটিম করে। নতুন বউঠান কাদম্বরী ধীরে ধীরে একেবারে একা হয়ে যান। কলকাতা শহর নিজের মতো নতুন নতুন চিন্তা করতে শেখে, নতুন নতুন আমোদ করতে শেখে, কাদম্বরীর বিরাট ঘরে সন্ধেবেলা আলো জ্বলে না। তাঁর ঘরের নম্র অন্ধকার থেকে একটা মৃদু সুগন্ধ ভেসে যায় বাতাসে।

তথ্য @ কলকাতা

রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফতরের ওয়েবসাইট

- **রাজ্য সরকার**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.banglarmukh.com**)
- **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর**, জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ এন এস রোড, কলকাতা-১ (**www.wbprd.nic.in**)
- **অর্থ দফতর**, নবান্ন, হাওড়া -৭১১১০২ (**www.wbfin.nic.in**)
- **স্বাস্থ্য দফতর**, স্বাস্থ্য ভবন, জিএন-২৯, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbhealth.gov.in**)
- **পরিবেশ দফতর** (**www.enviswb.gov.in**)
- **পূর্ত দফতর** (**www.pwdwb.in**)
- **পরিবহন দফতর**, পরিবহন ভবন, ১২ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১ (**www.vahan.wb.nic.in**)
- **কৃষি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.wbagrisnet.gov.in**)
- **সেচ দফতর**, জলসম্পদ ভবন, ব্লক-ডিএফ, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbiwd.gov.in**)
- **সমবায় দফতর** (নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (**www.coopwb.org**)
- **মৎস্য দফতর**, ৩১, ব্লক-জিএন, সেক্টর-৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbfisheries.gov.in**)
- **প্রাণী সম্পদ দফতর**, এলবি-২, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbard.gov.in**)
- **খাদ্য দফতর**, খাদ্য ভবন, ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭ (**www.wbfood.gov.in**)
- **শিক্ষা দফতর**, বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbsed.gov.in**)
- **তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.tathyabangla.gov.in**)
- **যুব কল্যাণ দফতর**, ৩২/১ বিবিডি বাগ (সাউথ), স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-১ (**www.wbyouthservices.in**)
- **নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দফতর**, বিকাশ ভবন, নর্থ ব্লক, দশম তল, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbsc.gov.in**)
- **বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর** (**www.wbdma.gov.in**)
- **ক্ষুদ্র শিল্প দফতর** (**www.mssewb.org**)
- **বিদ্যুৎ দফতর**, বিদ্যুৎ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbpower.nic.in**)
- **অচিরাচরিত শক্তি দফতর**, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (**www.wbreda.org**)
- **সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর**, অম্বর, ডিডি-২৭/ই, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbmdfc.org**)
- **অনগ্রসর কল্যাণ দফতর**, প্রশাসনিক ভবন, এসডিও বিধাননগর, চতুর্থ তল, ডিজে-৪, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.anagrasarkalyan.gov.in**)

আলোর রশ্মির মতো ভাস্বর হয়ে থেকে যাবেন নরেন্দ্রনাথ

সোমনাথ আদক

জয়নুল, আমার কাজটা ভালো করে করো। তাহলে তোমায় নিয়ে ভালো করে গল্প লিখব। আমার গল্পের মধ্যে তুমি বেঁচে থাকবে। হ্যাঁ অর্থনৈতিক, সামাজিক-মানসিক টানাপোড়নে অধীনতার খোলস থেকে নিরন্তর মুক্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তিনি, তাঁর গল্পে। 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, 'আমার কোন রচনাতেই অপরিচিতদের পরিচিত করার উৎসাহ নেই। পরিচিতরাই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।' তাঁর রচনার স্থান-কাল-পাত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কখনও সে গল্পের পটভূমি হয়ে উঠেছে শান্ত নিস্তরঙ্গ পল্লিজীবন, নগরমুখী মফস্‌সল শহরে ভাসমান মধ্যবিত্ত এবং মহানগরী কলকাতার সীমায়িত এলাকা; আবার কখনও দেশভাগ-দাঙ্গা-মন্বন্তর-যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত অর্থনীতি। জীবন কখনও একক দুঃখের কিংবা একক সুখের সমষ্টি নয়। নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখময় জীবনে সুখের আভাস তাঁকে বানিয়েছে সদর্থক জীবনের গল্পকার। সময়ের বিবর্ণ বর্ণচ্ছটা যখন আলোকিত করছে ঔপনিবেশিক শাসনে নিষ্পেষিত সমাজব্যবস্থা, সংকটের অতলে দুঃসহ জীবনের প্রতিচ্ছবি, তখন তাঁর মর্মস্পর্শী অন্তরাত্মা সন্ধান করছে মানুষের অন্তরলোক। চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যের পরিকাঠামো যখন ইতিহাসের পরিমণ্ডলস্পর্শী, এক ইতিহাস বোধ সংক্ষুব্ধ এবং হতাশা মগ্নতায় নৈরাশ্য জগতের তটভূমি, তখনই তাঁর শব্দে শব্দে গাঁথা গল্পে দৃশ্যমান শরীর দেখিয়েছে অন্ধকার থেকে উৎসারিত আলোর দিশা। কখনও হাঁটুজল জমা বস্তির ঘর থেকে দেড়খানা কোঠা বাড়ি আবার কখনও নিমতলার কাঠগুদামের কাঠের ঘর থেকে মাথাপিছু দু'টাকা ভাড়ার মেসবাড়ি হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টির আতুঁরঘর। তিনি সৃষ্টি করেছেন রাজমোহন, মকবুল, কৃষ্ণপ্রসন্ন, মোতালেফ, মাজুখাতুন, ফুলবানু, নুশরত আলী, রাবেয়া, অমূল্য, রেনু-র মতো চরিত্রদের। তাঁর 'চাঁদমিঞা', 'কাঠ গোলাপ', 'চোর', 'রস', 'পালঙ্ক', 'হেড মাস্টার', 'ভুবন ডাক্তার'-এর মতো ছোটগল্পগুলোতে। যিনি বাংলা সাহিত্যের অনেকটাই অনালোকিত, অনালোচিত। তিনি নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের ভাঙা উপজেলার সদরদি গ্রামে তাঁর জন্ম। ৩০ জানুয়ারি ১৯১৬, বাংলার ১৬ মাঘ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। পড়াশোনার শুরুও বাংলাদেশেই। ফরিদপুরের ভাঙা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ওই জেলারই রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ ও বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। বাবা মহেন্দ্রনাথ মিত্র। লেখালিখির হাতেখড়িও ছোটবেলাতেই।

আজ থেকে প্রায় ৮১ বছর আগে ১৯৩৬ সালে 'দেশ' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর 'মূক' শিরনামে ষোলো লাইনের কবিতাটি—

'তোমাকে ভালোবাসি একথা ক্ষণে ক্ষণে
বলিব তমা ভাবি সদাই মনে মনে
বলিতে যবে যাই কথা না খুঁজে পাই
হতাশ হয়ে ফিরি আপন গৃহকোণে...।'

প্রায় চার দশক ধরে গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি কবিতাও লিখেছিলেন টানা কুড়ি বছর প্রায়। প্রকাশ করেছিলেন নিজের কাব্যগ্রন্থ 'নিরিবিলি'। তাঁর সেই বইয়ের আলোচনা করতে গিয়ে 'কবিতা' পত্রিকায় স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু লিখলেন, 'শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের পাঠক সংখ্যা আজ বিপুল। কিন্তু এ-বই খানা পড়ে (বা দেখে) আজকের দিনে কম পাঠকেরই সন্দেহ হবে যে এর প্রণেতা ও তাঁদের কথাশিল্পী একই ব্যক্তি।' ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রথম গল্প 'মৃত্যু ও জীবন' প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়। গল্পটি পড়ে 'দেশ' পত্রিকার দফতর থেকে শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে চিঠিতে লিখলেন, 'আপনার গল্প আমাদের ভালো লেগেছে আপনি আরও গল্প পাঠান।' ওদিকে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় -র সম্পাদক মন্মথনাথবাবুও উৎসাহ দিয়েছেন চিঠি দিয়ে। লিখে চলেছেন নরেন্দ্রনাথ।

এদিকে ঘটে গেছে এক ঘোর বিপত্তি, কলকাতা ন্যাশনাল ব্যাংকের ছাপোষা কেরানি খুব ফেঁসেছেন, একটা জাল চেক

পাস করিয়ে দেবার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ মামলা করেছে। তাঁর তখন প্রাণান্তকর অবস্থা। সামান্য টাকা মাইনে, তার ওপর সেই ফরিদপুর থেকে কলকাতা এসে, শোভাবাজারের একটি মেসে ভাইকে নিয়ে থাকেন। সঙ্গে আরও তিনজন। একজন সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আর দুজন গেঞ্জি কলের শ্রমিক। মাথা পিছু মাসিক দু'টাকা ভাড়া। মেসের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই। টানাটানির সংসারে পাইস হোটেলে দু'বেলা দু'আনার ডিম ভাত, এইভাবে দিন চলে যার সে কীভাবে মামলা চালাতে পারে। হাজতবাস অনিবার্য, এমন সময় এই নিপাট ভালো মানুষটিকে বাঁচাতে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন দুই বন্ধু— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। মামলা লোয়ার কোর্ট থেকে সেশন কোর্টে গেল। টানা প্রায় একবছর মামলা চলার পর হাইকোর্টের জজ মিস্টার ব্লংক এক জব্বর রায় দিলেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বেজায় ধমক দিয়ে বললেন অভিযুক্ত একজন সাহিত্যিক মানুষ। তিনি অন্য জগতে বিচরণ করেন তাঁর তো ভুল হতেই পারে। দোষ ব্যাংকের তারা এমন মানুষকে ওই কাজে নিলেন কেন? বেকসুর ছাড়া পেলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ফিরে পেলেন চাকরি। জয়েন করেই রেজিগনেশন দিলেন। না, ওই চাকরি আর নয়। না খেতে পেয়ে মরে গেলেও নয়। ছেড়ে দিলেন ব্যাংকের চাকরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেকের মতো তিনিও চাকরি পেলেন অর্ডিন্যান্স কোম্পানিতে। কিন্তু সে চাকরিও তাঁর কপালে সইল না। শুরু হল কলকাতায় বোম পড়া। তাঁর বাবা মহেন্দ্রনাথবাবু বললেন, 'খবরদার তোমাকে আর বোম মাথায় নিয়ে চাকরি করতে হবে না।' সে চাকরি ছেড়ে তল্পিতল্পা আর ভাঙা মন নিয়ে আবার চললেন দেশের বাড়ি ফরিদপুর।

রোজগারের মন্দা ভাগ্য নিয়ে শুরু হল আবার লড়াই। পেন চলে কিন্তু সংসার চলে না। তবে নারায়ণ কিংবা নরেন্দ্রনাথ দু'জনেরই কোনও একজন যেদিন গল্প লেখার টাকা পেতেন সেদিন তিনজনে মিলে রূপবাণী রেস্টুরেন্টে ফাউল কাটলেট আর টকি শো হাউসে তিন আনার সিটে গ্যারিক বারের ছবি। তাছাড়া মাঝে মাঝে ওই মেসের ঘরেই বসত সাহিত্যের আসর। দুই লেখকের বন্ধুরা আসতেন। চলত সাহিত্যের আড্ডা। নিচে শ্যামসুন্দর কেবিন থেকে আসত এক পয়সা কাপের চা।

এভাবেই যখন দিন কাটে তো রাত কাটে না অবস্থা ঠিক তখনি বাড়ি থেকে চাপ আসতে থাকল বিয়ে করার জন্য। একে তো নিজেরই চলে না, তারপরে আবার বউ! নরেন্দ্রনাথের তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা। তাও বিয়ে করতেই হল বাড়ির চাপে। বিয়ে করলেন শোভনা দেবীকে। তারপর কখনও বস্তির টালির ঘর তো কখনও দেড়খানা কোঠা ঘরে সস্ত্রীক দু'ভাই ও দুই ছেলেকে নিয়ে চলল একের পর এক বাসা বদল। একবার কিছুদিনের জন্য নিমতলার কাঠ গুদামের কাঠের ঘরেও থাকতে হয়েছে। এমন দিনও গেছে সংসার খরচ চালানোর জন্য চাকরি করতে হয়েছে দু'বেলাই। তাও লেখা থামেনি। 'রস' গল্পটি যখন লিখছেন, তখন থাকতেন ব্রজদুলাল স্ট্রিটের একটি ঘরে। সেই ঘরে বর্ষাকালে একহাঁটু জল। ওই থই থই ঘরভর্তি নোংরা জলে তক্তপোষের ওপর বসে লিখে চলেছেন নরেন্দ্রনাথ।

দীর্ঘ চার দশক ধরে লিখেছেন প্রায় ৫০০টি গল্প। প্রথম গল্পসংগ্রহ 'অসমতল' প্রকাশিত হয় ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। গল্পগ্রন্থ প্রায় ৫০টি। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ৩৮টি। প্রথম উপন্যাস 'হরিবংশ'। প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৫০ সালে। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ', 'চেনামহল', 'তিনদিন তিন রাত্রি' ও 'সূর্যমুখী' 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই দারুণভাবে সমাদৃত হয় পাঠকের মনে। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে— 'রূপমঞ্জরী', 'অক্ষরেঅক্ষরে', 'দেহমন', 'দূরভাষিনি', 'অনুরাগিণী', 'সহৃদয়া', 'গোধূলি', 'চোরাবালি', 'জলপ্রপাত', 'কন্যাকুমারী', 'প্রথম তরণ', 'তার এক পৃথিবী', 'সেই পথটুকু', 'নীড়ের কথা', 'জল মাটির গন্ধ', 'অনাত্মীয়া', 'নতুন ভুবন' , 'সূর্যমুখী' , 'সিঁদুরে মেঘ', 'নির্বাসন' ইত্যাদি। গল্প সংকলন- 'অসমতল', 'হলদে বাড়ি', 'চড়াই উতরাই', 'সেতার', 'উল্টোরথ', 'পতাকা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটি হল 'জোনাকি'। তার অনেক গল্পই অনুবাদ হয়েছে হিন্দি, মরাঠি, রুশ, ইংরেজি ও ইতালীয় ভাষায়। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন সহ অনেকেই তাঁর রচনাকে চলচিত্রে রূপদান করেছেন। এরমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর', 'অগ্রগামীর হেডমাস্টার', 'বিলম্বিত লয়'; রাজেন তরফদারের 'পালঙ্ক'। এছাড়াও অমিতাভ বচ্চন অভিনীত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটি অবলম্বনে চলচ্চিত্রটির হিন্দি নাম 'সওদাগর'।

কর্মজীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে শেষে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন এবং আমৃত্যু সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬২ সালে পান 'আনন্দ' পুরস্কার। আনন্দবাজারে যোগদান করার পরে তাঁর অভাব ও অনিশ্চিত জীবন শেষ হয়। তিনি সপরিবারে চলে আসেন পাইকপাড়ায়। পাবলিশার্সদের কাছ থেকে টাকা ধার করে মেন রাস্তার পাশে দোতলা বাড়ি করেন। নিজের দীর্ঘ লড়াকু জীবন আর আর্থিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে ছ'লাইনের 'সুইজারল্যান্ড' কবিতায় লিখলেন, 'মেসের একতলা স্যাঁতসেঁতে ঘর/জীর্ণ তক্তপোশে সহস্র ছারপোকা/বাতাসে নর্দমার ঘ্রাণ।/উবু হয়ে বসে দেখি/ এক পয়সার মুড়ির ঠোঙাতে/ভুস্বর্গ সুইজারল্যান্ড।'

আসলে হয়তো ঘুপচি বস্তি বা মেসের একচিলতে ঘরে দিনের পর দিন কাটানোর যন্ত্রণা ভুলতে চেয়েছিলেন। হয়তো তাই প্রয়োজন না থাকলেও দোতলাটাকে তিনতলা করার সখ হল। ভাই ধীরেন্দ্রনাথকে বললেন সে কথা। ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, কী হবে দাদা তিনতলা করে? জবাবে নরেন্দ্রনাথ বলেন, থাক না। রিটায়ার করার পর না হয় ভাড়া দিয়ে দেব। সেকথা শুনলেন না তিনি। কী করবেন রিটায়ারমেন্টের পর? একটা অস্থিরতা যেন তাড়া করছে তাঁকে। শুরু হল তিনতলার কাঠামো তৈরির কাজ। হেড রাজমিস্ত্রি জয়নুলকে ডেকে বললেন, জয়নুল, আমার কাজটা ভালো করে করো। তাহলে তোমায় নিয়ে ভালো করে গল্প লিখব। আমার গল্পের মধ্যে তুমি বেঁচে থাকবে।

কালের প্রবহমান ধারায় বেঁচে থাকবে রক্ত-মাংসের জয়নুল। তাঁর সৃষ্টিতে অক্ষরের শরীর হয়ে বেঁচে থাকবে কৃষ্ণপ্রসন্ন, মোতালেফ, মাজুখাতুন, ফুলবানু, নুশরত আলী, রাবেয়া, অমূল্য, রেনু-র মতো চরিত্ররা। আর পাঠকের নিভৃত মনের চিরাগে আলোর রশ্মির মতো ভাস্বর হয়ে থেকে যাবেন নরেন্দ্রনাথ।

৩
কলকাতা
যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১৫ মে ২০১৭
এই প্রথম কোনও বাংলা দৈনিকে সপ্তাহে সাতদিনই রঙিন সাপ্লি
আপনার এলাকায় যুগশঙ্খ না পেলে ফোন করুন সার্কুলেশন বিভাগে

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১৫ মে ২০১৭

রাজপথের রাজচাকা আজ অবলুপ্তির পথে

স্বর্ণালী পাল

‘চলে বাবু?’

অনুমতি পেলেই টুং-টাং শব্দ করে হেলেদুলে চলতে থাকে বাবুর অফিসের দিকে। শুধু অফিস নয়, বাজার যাওয়া, বন্ধুর বাড়িতে ঘুড়তে যাওয়া সবক্ষেত্রেই রোদ, ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাবুর বাহন ছিল এক হাতেটানা রিকশা। তার বিহারী চালক বিরেন্দর ছিল তার অনুগত সৈনিকের মতো। বাবু রিটায়ার্ড হলেও সেই রিকশাচালক কিন্তু রিটায়ার করেনি। অবসর সময়ে একটু তাস খেলতে যাওয়া বা গঙ্গার পাড়ে ঘুড়তে যাওয়ার সময় বিপত্নীক সেই বাবুর একমাত্র সঙ্গী ছিল রিকশাচালকই। কোথায় রিকশা দাঁড় করিয়ে পান কিনতে হবে বা জল কিনতে হবে তা তাকে বলে দিতে হতো না। কিন্তু বয়সের ভারে সেই বাবু এখন আর বেশি বেরোতে পারেন না। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই রিকশাচালকেরও বয়স হয়েছে। তবে তার কিন্তু বিরাম মেলেনি। তবে এমন পার্মানেন্ট কোনও সওয়ারি সে পায়নি, তাই যাত্রীর জন্য দিনভর রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করতে হয়। কখনও কখনও লুঙ্গি আর ছেড়া স্যান্ডো গেঞ্জি পরা সেই বিরেন্দরকে দেখা যায় রিকশার মধ্যেই গামছা পেতে ঘুমাচ্ছে। আবার কখনও দেশওয়ালি ভাইদের সঙ্গে তাদের প্রিয় ১৬ গুটি খেলায় মেতে থাকতে দেখা যায়। যদিও-বা যাত্রী মেলে কখনও কখনও ভাড়া এত কম পায় যে খাটনি পোশায় না। একারণেই হয়তো রিকশাচালক বিরেন্দরের প্রায় সব দেশওয়ালি ভাই রিকশা টানা ছেড়ে অন্য কিছু চালাচ্ছে। কিন্তু বৃদ্ধ বিরেন্দরকে বারবার বলা সত্ত্বেও সে রিকশা ছাড়তে পারেনি। প্রায় ৩০ বছর ধরে এই শহরের ওলিতে-গলিতে সে বাবুদের নিয়ে সফর করিয়েছে। কলকাতার অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী সে। সরকারের তরফ থেকেও তাকে বার কয়েক বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সন্তানসম সেই রিকশাকে সে ছাড়তে পারেনি। প্রথম জীবনে ওস্তাদের ৩০টা রিকশার মধ্যে প্রতিদিন সকালে যে কোনও একটা নিয়ে সে রাস্তায় বেরতো। তাতে রোজগারের অর্ধেক টাকা ওস্তাদকেই দিয়ে দিতে হতো। তাই অনেক কষ্টে নিজেই একটা হাতে টানা রিকশা কিনে চালাতে শুরু করে। তখন রোজগারও হতো ভালো। কিন্তু শহর যত আধুনিক হতে থাকল, তার রোজগার তত কমতে থাকল। যাত্রীরা ক্রমশ মোটরগাড়ির উপর বেশি ভরসা করতে শুরু করল। সবশেষে রাজ্য সরকার হাতেটানা রিকশাকে অমানবিক ঘোষণা করায় কফিনে কার্যত শেষ পেরেক পড়ল। তাই কলকাতার রাজপথে এখন আর শোনা যায় না সেই টুং-টাং শব্দ। একে একে গরুর গাড়ি, পালকি, ঘোড়ার গাড়ি, তারপর ঐতিহ্যবাহী দু’চাকার রিকশাও উধাও। উত্তর কলকাতার অলিগলিতে খুঁজলে হয়তো হাতেটানা রিকশা দেখা যায়, তবে দিন দিন তার সংখ্যাটা কমছে। তবে বয়স্ক মানুষরা এখনও দু’চাকার রিকশা চড়তে পছন্দ করেন কারণ এই যানটিকে তাঁরা মনে করেন হ্যাসল ফ্রি। উত্তর কলকাতার অনেক বাসিন্দাই আজও দু’চাকা রিকশায় চড়ে দুলকি চালে সফর করতে বেশ পছন্দ করেন। অনেকে আবার বিকেলের হাওয়া গায়ে মেখে দু’চাকা রিকশায় বসে পুরনো দিনগুলি ফিরে পান। কেউ আবার জীবনে প্রথমবার এই রিকশায় চড়ার শখ মিটিয়ে নিতে চায়। এরকম অনেক কলকাতাবাসীর কাছে এখনও দু’চাকা রিকশার গুরুত্ব রয়ে গেছে।

কয়েকবছর হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ধরনের পরিবহন ব্যবস্থাকে অমানবিক বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং কলকাতাবাসীরও একই মত। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে শারীরিক বল দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা একদিকে যেমন অমানবিক তেমনই আজকের সমাজের কাছে দৃষ্টি অশোভনও বটে। তাই সবদিক বিবেচনা করে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এই যানকে। তবুও এই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কলকাতার রাস্তায় এখনও কতিপয় রিকশা দেখা যায়। তাছাড়া এই রিকশার গতি কম, পরিবর্তে চালকের শারীরিক পরিশ্রম বেশি। ধীরগতির যানের কারণে রাস্তায় যানজট তৈরি করে হাতেটানা রিকশা। অন্যান্য দ্রুতগতির যান যেমন বাস, লরি, ট্যাক্সির মাঝে রিকশার সওয়ারি হওয়াও মোটেই নিরাপদ নয়। তাই পুলিশ প্রধান সড়কগুলিতে যেখানে ব্যাস্ত ট্রাফিকের তাড়াহুড়ো সেখানে দু’চাকা রিকশা চালানোর অনুমতি দেয় না। ফলে অবশিষ্ট রিকশা চালক থেকে শুরু করে রিকশার মালিক, রিকশা মেরামতির দোকানগুলি শুয়ে বসে অর্থ কষ্টে দিন গুজরান করছে। যেহেতু প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে তাই, পুলিশও যেখানে সেখানে তাদের রোক্কে দেয়, বা পয়সা নেয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

দু’চাকার বদলে এসেছে নানা আধুনিক যান। প্রথমে পণ্য পরিবহন ও পরে যাত্রী পরিবহনের জনপ্রিয় ও পরিবেশবান্ধব এই টানা রিকশা ক্রমশ অবলুপ্তির পথে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমানে শুধু প্যাডেলওয়ালা রিকশা নয় মোটরচালিত বৈদ্যুতিক রিকশাও খুবই প্রচলিত এর গতি স্বাভাবিক ভাবেই বেশি এবং চালকের পরিশ্রম আরও কমে গেছে। যদিও মোটর চালিত রিকশাগুলির বৈধতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তবে রিকশা চালকদের হাড়ভাঙা খাটুনির দিন শেষ হয়েছে। হাতেটানা রিকশা থেকে প্যাডেল রিকশা যেমন চালকদের পরিশ্রম কমিয়েছে তেমনই গতি দিয়ে সওয়ারির সুবিধা করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় আয়ও বেড়েছে চালকদের। সমাজের ব্যস্ততা বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে রিকশা চালকদের প্যাডেল চাপার দিনও হয়তো শেষ হয়ে যাবে।

বাড়ির কর্তারা আগে ধোপদুরস্ত হয়ে কাজে বেড়নোর সময় পছন্দের চালক সদর দরজার সামনে হাতেটানা রিকশা নিয়ে বসে থাকত। কর্তা বাইরে এলেই চালক ব্যাগটা রেখে দিয়ে রিকশা চালিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিত। এই ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের চেনা চিত্র কিন্তু বর্তমানে রাস্তায় হাজারও রিকশা ইচ্ছেমতো দরদাম করে বা না করেই একটাতে উঠে বসা।

প্রায় ১৫০ বছর আগে জাপানে আবিষ্কৃত হয় হাতেটানা রিকশা। ভারতের প্রথমে সিমলা ও পরে ১৯০০ সালে আসে কলকাতার রাস্তায়। ১৯১৪ সাল নাগাদ পরিবেশবান্ধব এই যানটি কলকাতা পৌরসভার কাছ থেকে মনুষ্য বহনের অনুমতি পায়। তার আগে পর্যন্ত মালপত্রই বহন করা হতো। এখনকার রিকশা চালকদের তুলনায় তখনকার দিনে আয় স্বভাবতই খুব কম ছিল।

কলকাতার শিয়ালদহ, কলেজ স্ট্রিট, নিউ মার্কেট প্রভৃতি এলাকায় যে-রিকশা দেখা যেত তাদের বেশিরভাগেরই নিজের রিকশা ছিল না। তবে তার জনপ্রিয়তা ছিল প্রভূত। বিশেষ করে জল থই থই কলকাতার রাজপথে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পৌছে দেওয়া বা বইপাড়ার বই এক জায়গা থেকে অন্যত্র পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এর কোনও জুড়ি ছিল না। সেই চালকরা অবশ্য সর্দারের থেকে রিকশা নিয়ে চালাতেন। সর্দাররা আবার রিকশার মালিকের থেকে নিয়ে ভাড়া খাটাত। তাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রমী চালকদের ভাগে থাকত সামান্যই টাকা। যা আজ কলকতার রাজপথ থেকে অতীত। তিন চাকার রিকশায় সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি তাই দিনের শেষে সওয়ারি না পাওয়া রিকশাটাকে যেন ব্যস্ত শহর ছুটে এসে কর্কশ কলরবে মনে করিয়ে দেয় সময় হয়েছে বিদায় নেওয়ার। তাই আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় ব্যস্ততম কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্য টানা রিকশা অচিরেই হারিয়ে যেতে চলছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে হাতেটানা রিকশা শুধুই বইয়ের পাতার ছবি হয়ে থাকবে।

ফোটো: প্রলয় হাজরা

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৫ মে ২০১৭

নগরোন্নয়ন

ঝুমা দাস মল্লিক

চারপাশে ঘন জঙ্গল। আর পুবদিকটা তো জঙ্গলেই ঢাকা। ওই যে দক্ষিণে রয়েছে আদি গঙ্গা আর গোবিন্দপুর গাঁ। বড়কর্তা গোল্ডসবরা সাহেব বলে তো দিলেন, কোম্পানির পতাকাটা পুঁতে দিতে। কিন্তু লোক কই? মানুষের চেয়ে বাঘ-ভালুকের গুনতিই বেশি হয়ে যায়। চার্নক সাহেবও হুকুম জারি করলেন, যে কেউ জঙ্গল সাফ করে বাড়ি বানাতে পারে। বসতি তো চাই!

১৬৯৮ সালে সাবর্ণ চৌধুরীদের থেকে কেনা হল সুতানুটি, কলিকাতা আর গোবিন্দপুর। দাম পড়ল ১৩০০ টাকা ২ পাই। মোট ১৭১৮ বিঘা জমি; তার মধ্যে ৪৮৮ বিঘা বাজার এলাকা আর বাকি অঞ্চলে লোকেদের বাসাবাড়ি। এছাড়া ক্ষেত-বাগান-বরজ তো আছেই। কিন্তু বাড়িঘর কোথায়? কেন আছে তো! ৮০০০ মেটে বাড়ি, ৮টি পাকাবাড়ি। আর লালদিঘির পাড়ে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারি বাড়ি। ১৭০২ সালের কলকাতা ছিল এমনই। রাস্তা মোট ২টি, আর গলিও ২টি।

লালদিঘিকে ঘিরেই তখন বেড়ে উঠছে ইংরেজের বসতি। ইংরেজ বানাল তাদের কেল্লা-ফোর্ট উইলিয়াম। লালদিঘির জল, রঙে লাল করে দোল খেলত চৌধুরীরা। এবার সেই জলের আয়নায় মুখ দেখে ইংরেজের কেল্লা। ইতিহাস বদলায়। ফোর্টের উত্তরে ক্লাইভ স্ট্রিটের দিকে বাড়তে লাগল ইংরেজের কলকাতা-হোয়াইট টাউন। দুর্গম জঙ্গলের আড়াল থেকে ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে চলেছে চৌরঙ্গি। নতুন ইতিহাস রচনার সময় আসন্ন ।

ইংরেজের হোয়াইট টাউনের বিপরীতে গড়ে উঠছিল দেশি আদমিদের বসতি ব্ল্যাক টাউন। সরু নোংরা রাস্তাঘাট,মাটির দেওয়াল, খড়ের চালের কুঁড়েঘর। সিমলে, ঠনঠনে, পোস্তা, মলঙ্গা, কলিঙ্গা— এসবই ছিল ইংরেজদের আসার আগে স্থাপিত বিভিন্ন গ্রাম। চরিত্র অনুযায়ী জায়গাগুলির নামকরণ করা হয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, সিমলে অঞ্চলে ছিল তাঁতিদের বাস। বসতিহীন শুকনো ডাঙা বোঝাতে ঠনঠনে। গঙ্গা তীরবর্তী মাল নামানোর স্থান পোস্তা। এটি একটি ফারসি শব্দ। মলঙ্গ দেশের অর্থাৎ নেপাল, তিব্বত, ভুটানের অধিবাসীদের আবাস ছিল মলঙ্গা— বহুবাজার ও জানবাজারের মধ্যবর্তী অঞ্চল। জানবাজারের পুরনো নাম কলিঙ্গা— এটি ওড়িশার অধিবাসীদের বসতি। ইংরেজদের অধীনস্থ হওয়ার পরেও অনেক জনবসতির বিস্তার ঘটে। বাগবাজার, শ্যামবাজার, লালবাজার, বালিগঞ্জ, বেলেঘাটা, ট্যাংরা প্রভৃতি।

নেটিভ টাউন বা ব্ল্যাক টাউনের জমি বিলি, খাজনা আদায়, বিচার-ব্যবস্থার দেখাশোনার জন্য তৈরি হল জমিদার পদ। ১৭২০ সালে গোবিন্দরাম মিত্র এই দায়িত্ব পেলেন। কলকাতার এই প্রথম দেশীয় ডেপুটি জমিদারের দক্ষতায় খুশি ইংরেজ তাঁর বেতন বাড়িয়ে ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকা করে দিল। আপার সারকুলার রোডে ছিল তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি। মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু ছিল গোবিন্দরামের তৈরি নবরত্ন মন্দিরের চূড়া। এর দক্ষিণে ছিল আরেক ধনী উর্মিচাঁদের বাড়ি। নেটিভ কলকাতার উল্লেখযোগ্য পাকা বাড়ি ছিল এগুলি। ব্ল্যাক টাউনের এইসব ধনী গৃহের ছিল নিজস্ব বাগান, নিজস্ব আঙিনা। অনেকটা প্রশস্ত জায়গা নিয়ে ছিল এইসমস্ত বাড়ির নির্মাণ। ডাকাতদের আক্রমণ প্রতিহত করার নানা কৌশল এই বাড়িগুলিতে থাকত।

কলকাতার জনসমাগম বৃদ্ধির নানা চেষ্টা করছিল কোম্পানি। ১৭০৪ সালে নির্দেশিকা জারি হল, দিশি লোকেদের প্রদত্ত জরিমানার টাকায় শহরের খানা ডোবা ভরাট ও নর্দমা নির্মাণের কাজ হবে। নগর পরিকল্পনা চলছিল। ১৭০৭ সালে যেখানে-সেখানে পুকুর ও বাড়ি তৈরি বন্ধ করে দেওয়া হল। এই শহরকে একটা সুপরিকল্পিত রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন নিয়ম-কানুন ও শাসনব্যবস্থা। ১৭২৭ সালের মধ্যে তৈরি হল ৪টি আদালত ও জেলখানা।

১৭০৯ সালে কাটা হয়েছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের পুকুর। শহরটা বেশ সেজে উঠছিল। কিন্তু ১৭৩৭ সালে হঠাৎই ঘটল ছন্দপতন। দিনটা ৩০ সেপ্টেম্বর। ধেয়ে এল প্রবল আশ্বিনের ঝড়, সঙ্গে প্রবল ঢেউ উঠল নদীতে। শহরের অনেক কিছুই তছনছ করে দিল। গোবিন্দরাম মিত্রের অত সাধের নবরত্ন মন্দিরের চূড়া গেল উড়ে। গির্জার চূড়া ভাঙল। বহু ঘরবাড়ি ধূলিস্যাৎ হল। স্যার ফ্রান্সিস রাসেলের চিঠির ভাষায়— 'মনে হচ্ছে যেন গোটা শহর জুড়ে বোমাবর্ষণ করে গেছে শত্রুপক্ষ'।

বেচারা কলকাতা! বিপদের আর শেষ নেই। ঝড়ের ধাক্কা কাটতে না কাটতেই বর্গি হাঙ্গামার খবর। ধেয়ে আসছে বর্গিরা। শশব্যস্ত ইংরেজের মনে ভয়— আবারও কি বাস্তুচ্যুত হতে হবে! কলকাতা বাঁচাও-কলকাতা বাঁচাও! কিন্তু টাকা কোথায়? কেন কলকাতার উর্মিচাঁদ এবং শেঠেদের মতন ধনকুবের আছে না! ধার পাওয়া গেল টাকা। বাগবাজার থেকে হেস্টিংস পর্যন্ত কাটা হল মারাঠা ডিচ। সালটা ছিল ১৭৪২। যাই হোক বর্গি আর কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তবে দেশে বর্গি না এলেও খাজনা দেওয়ার লোক এল প্রচুর। কারণ বর্গি হানায় ভয়ে অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন কলকাতায়।

আবারও ঘটনার ঘনঘটার কেন্দ্রে কলকাতা। মাঝে ঘটে গেছে পলাশির যুদ্ধ। সিরাজের সাধের আলিনগর নামটিরও অস্তিত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছেন ক্লাইভ। ১৭৫৬ সালে ১৯ জুন-এর যুদ্ধের শোধ বোধহয় এতদিনে নেওয়া হল। ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধ পালটে দিল ইতিহাসের গতিপথ। যুদ্ধ সন্ত্রস্ত পলাতকদের ফেরানোর জন্য আবার ঘোষণা। নিজের খরচে যে যেখানে বাড়ি বানাবে তারই মালিকানা থাকবে। পুরনো কেল্লাটা সিরাজের আক্রমণে ভেঙেচুরে একাকার। ক্লাইভের সিদ্ধান্তে নতুন কেল্লার স্থান নির্বাচন হল গোবিন্দপুরে। সেখানকার শেঠ, বসাকদের মতো বাসিন্দাদের ভিটেছাড়া হতে হল, ক্ষতিপূরণের অর্থের বিনিময়ে। এই সময়ই চৌরঙ্গির জঙ্গল কাটতে কাটতে নতুন রাস্তা বের হল।

১৭৬২ সাল। কলকাতার ভাগ্যে আবার সর্বনাশ। এবার মহামারিতে ৫০,০০০ মানুষের মৃত্যু হল। ১৭৭০ সালে একসঙ্গে হামলা করল দুর্ভিক্ষ ও মহামারি। হিকির গেজেটের খবর অনুযায়ী, ১৫ জুলাই থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৬০০০ মানুষ মারা যায়। মারাঠা ডিচ খোলা নর্দমায় পরিণত। চতুর্দিকে অগণিত শব। অবশ্য রোগ-ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ, কলকাতার প্রতিনিয়তই চলত। চিকিৎসার সুযোগ ছিল সীমিত। এর আগে ১৭১০ সালে হ্যামিলটনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১২০০ ইংলিশ ম্যানের মধ্যে ৬০ জন মারা যায় ৫ মাসের মধ্যে। ম্যালেরিয়া ছিল নিত্যকার গল্প। ১৭০৫ পর্যন্ত ডাক্তার ছিল হাতেগোনা। নাহ্, কলকাতায় থাকতে হলে চিকিৎসা নিয়ে একটু ভাবা দরকার। ফিভার হসপিটাল কমিটি গঠিত হল। ১৮২৪ সালে তৈরি হল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন। ১৮৩৫ সালে কলকাতা পেল প্রথম মেডিক্যাল কলেজ।

কথার স্রোতে পড়ে আমরা একটু এগিয়েই গিয়েছিলাম। ১৭৬২-র মহামারি কলকাতাকে সম্প্রসারিত করল। সাহেবরা মূল কলকাতার বাইরে ফাঁকা স্থানগুলোকে বাসস্থান হিসাবে বেছে নিতে লাগলেন। স্যার উইলিয়াম জোন্স গার্ডেনরিচকে, স্যার ইলাইজা ইম্পে প্রথমে কাশীপুর ও পরে মিডলটন রো-র কাছে বাসস্থান বেছে নিলেন। এই নাম দুটি উদাহরণস্বরূপ। এরকম অনেকেই ফাঁকা জায়গায় বসতি স্থাপন করছিলেন। কলকাতার পরিসর বৃদ্ধি হচ্ছিল। স্যার ইম্পের বাড়ির চারপাশে হরিণ চড়ত। সেই থেকে ডিয়ার পার্ক, আর সেখান থেকেই পার্ক স্ট্রিট। বাগবাজারে পেরিন সাহেবের বাগানও ছিল বিখ্যাত।

১৭৬৩ সালে ক্লাইভ ফিরে গিয়েছিলেন স্বদেশে। ১৭৭২ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর জামানা। ক্লাইভ কলকাতার নাম দিয়েছিলেন 'সিটি অব প্যালেস'। হেস্টিংস বজায় রাখলেন সেই ধারা। কলকাতার চাই নতুন নতুন রাস্তা আর বাড়ি। তার জন্য টাকা চাই। লটারি খেলার প্রচলন করলেন হেস্টিংস। এই লটারি খেলার টাকাতেই একে একে গড়ে উঠছে টাউন হল, স্ট্র্যান্ড রোড, কলেজ স্ট্রিট,ওয়েলিংটন স্কোয়ার, আর্মহার্স্ট স্ট্রিট ইত্যাদি। আজকের কলকাতা রূপ নিচ্ছিল ধীরে ধীরে। ১৮০৩ সালের ২৬ জানুয়ারি রাজভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে ওয়েলেসলি আয়োজন করেছিলেন বলনাচের। পুরনো রাজভবন ছিল পুরনো ফোর্ট উইলিয়ামের পাশে। ১৭৭৪ সালে তৈরি হয় কলকাতার প্রথম ডাকঘর, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে। ১৮৬৮ সালে তৈরি হল জিপিও। ১৮৩৩ সালে নির্মিত হল কারেন্সি অফিস। তৈরি হল কলকাতা হাইকোর্ট ১৮৬২ সালে। সারা কলকাতা জুড়ে তৈরি হচ্ছিল একের পর এক ভবন— বিবিধ তাদের প্রয়োজন। এত সীমিত পরিসরে তাদের তাদের সকলকে আনা যাবে না।

১৭৭০ সালে রিচার্ড বারওয়েলের মুখপত্র মিস্টার লায়ন্স একটি প্রকাণ্ড চওড়া বাড়ি বানান। ১৭৮০ সালে বছরে ৩১,৭২০ টাকা করে লিজ নেয় কোম্পানি সরকার। তখনও কলকাতায় হোটেল প্রচলন হয়নি। এখানে নানা ধরনের মানুষ দল বেঁধে থাকতেন। একতলায় ছিল নানান দোকান, গুদাম আর ভাঁড়ার ঘর। কোম্পানি তাদের সদ্য আগত রাইটার্স বা কেরানিদের থাকার জায়গা হিসাবে এটিকে ব্যবহার করা শুরু করে। তারপর তো ইতিহাস। প্রয়োজন পালটেছে, তকমাও বদলেছে। ব্রিটিশ শক্তির নিরাপদ দুর্গ ক্রমশ হয়ে ওঠে স্বাধীন দেশের রাজ্য সরকারের ক্ষমতার অলিন্দে। আজও সে তার গরিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইতিহাসের নিয়ম মেনে এভাবেই এগিয়ে চলছে কলকাতা। ভাঙা-গড়া-আবার ভাঙা। মেট্রো কলকাতা তার ১৮৮৬.৬৭ বর্গ কিমি-র সঙ্গে জুড়ে নিয়েছে আরও ১৮৫ বর্গ কিমি-র মেগাসিটি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, দূষণ আর মহানগরীর সমস্ত ভালোমন্দ, দোষগুণ নিয়ে সে ব্যারাকপুর, বারাসাত, সোনারপুরের বিস্তৃত। আর এই পরিসর নিয়ে Extended Kolkata.

বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য জানতে

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড (২৩৫৯১৯১৫, ২৩৩৭১১৫০)

সিইএসসি গ্রাহক পরিষেবা (২৪৭৮৪৩০২, ২৪৭৮৪৮৮৮, ২৪৭৮৪৮৮৯)

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৫ মে ২০১৭

আজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুশোতম জন্মদিন

দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান

অরিজিৎ মৈত্র

বৈশাখেই জন্ম ঠাকুরবাড়ির তিন কৃতী সন্তানের। ২২শে জন্মেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ২৫শে রবীন্দ্রনাথ আর ৩১শে দেবেন্দ্রনাথ। ২৫ বৈশাখের প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা মুখরিত হয় কথায়, কাব্যে ও গানে। দেশজুড়ে চলে রবীন্দ্র প্রণাম। কিন্তু অতীতের প্রখ্যাত নাট্যকার, লেখক, সংগীতরচয়িতা, কবির প্রিয় নতুনদাদা অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে যেমন আমরা ভুলতে বসেছি, তেমনই বিস্মৃত হয়েছি মহর্ষিদেবকে। ভুবনডাঙার দিগন্তবিস্তৃত রাঙামাটির মধ্যে দুটি নিঃসঙ্গ ছাতিম গাছের নীচে তিনি যদি ক্ষণকাল বিশ্রাম নিয়ে ধ্যানরত না হতেন তাহলে, আমরা পেতাম না রবীন্দ্রনাথের সাধের ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয়কে। মহর্ষিদেবের ব্যক্তিত্ব, ধর্মচিন্তা, জমিদারির প্রজাপালন, বিচক্ষণতা, ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনা, জ্ঞানের পরিধি— সবই ছিল স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখছি, আর হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের— যা একদিকে দুর্গম, আরেকদিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা, চিন্তায়, পূজায়, কর্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল যা সর্বকালীন। যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।'

উপনয়নের পরবর্তী সময়ে প্রাণাধিক রবিকে বিদ্যালয়ের সতীর্থ ছাত্রদের কৌতুকের হাত থেকে উদ্ধার করে পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে গেলেন হিমালয়ের কোলে ডালহৌসির বক্রটায়। কৌতুকের বিষয় অবশ্যই বালক রবির মুণ্ডিত মস্তক। সেখানেই মহর্ষির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হলেন পুত্র রবি। কবির স্মৃতিচারণায় পাই, 'বক্রটায় যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে, কে সহায় ভব অন্ধকারে।' তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন— সেই

সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।' আধ্যাত্মতত্ত্বের জন্য প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রবল ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে আমরা তাঁর পরিচয় পাই। এর পর থেকে ১০-১১ বছর তিনি একাগ্র চিন্তায় ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন।

উপনিষদকে তিনি এমনই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন যে নিজ চিন্তালব্ধ কোনও সত্যকে যতক্ষণ তিনি উপনিষদে প্রতিবিম্ব না দেখতেন এবং সেই সত্যকে যতক্ষণ তিনি উপনিষদের ভাষায় স্মরণ ও প্রকাশ করতে না পারতেন, ততক্ষণ তিনি হৃদয়ে তৃপ্তি পেতেন না। উপবীত পরিত্যাগ এবং হিন্দুধর্মকে ত্যাগ করে মহর্ষিদেব যে ব্রাহ্মধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন একথা সবারই জানা এবং এ বিষয়ে নিন্দা ও প্রশংসা দুই তাঁর কপালে জুটেছিল। পিতৃশ্রাদ্ধও করেছিলেন নিভৃতে নিজমত অনুসারে। পূর্বেই বলেছি যৌবনেই দেবেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই পরিপেক্ষিতে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৭৫৭ সালে যখন তাঁর দিদিমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন পিতা দ্বারকানাথ এলাহাবাদ অঞ্চলে গিয়েছিলেন। এমন সময় বৈদ্য এসে রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, 'এঁকে আর গৃহে রাখা হইবে না'। সুতরাং তাঁকে নিয়ে সবাই গঙ্গাতীরে চললেন। সেখানে মৃত্যু পথযাত্রী তিনরাত্রি জীবিত ছিলেন। দিদিমা অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর পূর্বদিন রাতে তিনি নিমতলা ঘাটে একখানা চাঁচের উপরে বসেছিলেন। যখন নামসংকীর্তন চলছে, 'এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে', সেই সময় দেবেন্দ্রনাথের মনে এক আশ্চর্য উদাসভাব উপস্থিত হয়। তখন তাঁর ২১ বছর বয়স। সেই মুহূর্ত থেকেই ঐশ্বর্যের ওপর একেবারে বিরাগ জন্মাল। মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হল।

তাঁর জীবনের আরেকটি প্রধান কীর্তি হল তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা। এই ঘটনা তাঁর ধর্ম ও কর্মজীবনের এক মস্ত বড় অধ্যায়। আধ্যাত্মিক প্রেরণাবশে এই সমাজের প্রতিষ্ঠা হলেও কয়েকটি সমসাময়িক অন্য কতগুলি বিষয়ও দায়ী ছিল। তখনকার শিক্ষিত সমাজের প্রায়শ স্বধর্মে অনাস্থা, স্বসংস্কৃতির উপর অশ্রদ্ধা ও পরশ্রীকাতরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। মহর্ষিদেবের শিক্ষা-দীক্ষা ছিল এর ঠিক বিপরীত। হৃদয়ে ধর্মবুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অনাস্থা অশ্রদ্ধার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আলোচনা ও প্রচারের জন্য যত্নপর হলেন। পাশাপাশি দ্বারকানাথ ঠাকুরের ফেলে যাওয়া জমিদারি, ঠাকুর এস্টেটের পরিচালনা করেছেন স্বহস্তে। পরবর্তীকালে সঠিক সময়ে পুত্র রবীন্দ্রনাথের হাতে এর দায়িত্বও তুলে দিয়েছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন বর্তমান ভারতের এক পরম গৌরবের বস্তু। লোকালয়ে বাস করেও এবং সংসার ধর্ম ও কর্মে নিযুক্ত থেকেও তিনি একটি তুষারশুভ্র গিরিশীর্ষের মতো। সংসার থেকে ঊর্ধ্বতর ও পবিত্রতর লোকে বিরাজ করতেন। সবের মধ্যে থেকেও আত্মজ্ঞান লাভ করে মহর্ষিদেব লিখলেন, 'দেহজ্ঞান, দিব্যজ্ঞান, দেহপ্রীতি, শুদ্ধপ্রীতি, তুমি মঙ্গলআলয়, ওহে তুমি মঙ্গলআলয়।'

চলতে চলতে কলকাতা দেখা: এসপ্ল্যানেড টু গালিফ স্ট্রিট

যাত্রা কোম্পানির হালহকিকত

পান্থজন

যাত্রা দেখে 'পথের পাঁচালী'-র অপুর সাধ হয়েছিল রাজপুত্র সাজবার। ছেঁড়া রাংতায় মোড়া কাগজ দিয়ে সেই সাধ পূরণ করবার চেষ্টাও করেছিল। চারিদিক খোলা জায়গার মধ্যে মাঝখানে স্টেজ বেঁধে বহুকাল ধরে যাত্রা নামক এক আদি সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করে আসছেন গ্রামবাংলার মানুষ। শহরাঞ্চলে যে যাত্রা কখনওই দেখা যায় না এমন নয়। কিন্তু শহরের উপকণ্ঠের মানুষ মেঠো পথ পেরিয়ে, বহুক্রোশ পায়ে হেঁটে রাত জেগে আজও যাত্রাপালার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। আপাতত আমি গরমের কড়া তেজকে উপেক্ষা করে মেঠো পথের পরিবর্তে, কালো পিচের রাস্তায় হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছি চিৎপুরের পরিচিত যাত্রাপাড়ায়।

এই পথের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হল যাত্রাপাড়া। বিডন স্কোয়ার অধুনা রবীন্দ্রকানন সংলগ্ন রাস্তার দু'ধারে হরেক রকমের যাত্রা কোম্পানি। রংবেরঙের ফ্লেক্স থেকে জানা যায় কোম্পানির নামগুলি। সেগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতরত্ন যাত্রা কোম্পানি, দা নিউ অগ্রগামী যাত্রা কোম্পানি, সরকার অপেরা, বঙ্গলক্ষ্মী অপেরা, মুক্ত মঞ্জরী, মা তারা অপেরা, দেবী বন্দনা যাত্রা কোম্পানি ইত্যাদি। পথ চলতে গিয়ে জানতে ইচ্ছে করে এইসব নাট্য কোম্পানির অতীতদিনের কথা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটি গানের লাইন। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এবং উত্তম-সাবিত্রী অভিনীত 'নিশিপদ্ম' ছবিতে ব্যবহৃত 'আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না।' না, বেশি গানের কথা বলব না, কারণ পাঠকমহলে ইতিমধ্যেই বদনাম রটেছে পান্থজন নাকি গানের মানুষ, তাই কোনও বিষয় নিয়ে লিখতে বসলেই সংগীত এসে ভর করে তাঁর লেখনিতে। আপাতত সুরের জগত থেকে অভিনয়ের জগতে প্রবেশ করি। অনুমতি নিয়ে বঙ্গলক্ষ্মী অপেরার অফিসে ঢুকে সাদর অভ্যর্থনা পেলাম যাত্রাশিল্পের সঙ্গে গত ৪৭ বছর ধরে যুক্ত প্রবীণ কর্মী রমেন পালিতের কাছ থেকে। তাঁর কাছ থেকেই শোনা গেল যাত্রার মতো জনপ্রিয় মাধ্যমের অনেক কথা।

এক সময়ের ব্যস্ত এই যাত্রাপাড়ায় আজ দেখা দিয়েছে ভাঁটার টান। তার মানে যে যাত্রাশিল্প শেষ হয়ে যাচ্ছে, এমন নয়।

যাত্রাশিল্পে আজ ভালো মানুষের বড় অভাব। তার জন্য হয়তো যাত্রার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই দায়ী। আর একটা বড় সমস্যা হল যাত্রার পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সংগঠক ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে বেসরকারি চ্যানেলের সিরিয়ালের সঙ্গে। রমেনবাবুর মতো ব্যক্তিরা মনে করেন যাত্রার স্বর্ণযুগ অনেকদিন আগে থেকেই হারিয়ে যেতে বসেছে। সেই সময় চলচ্চিত্র শিল্প থাকলেও, আজকের মতো মিডিয়ার উৎপাত ছিল না। এখন সন্ধে হলেই মানুষ টিভি সেটের সামনে বসে যান। কী গ্রাম, কী শহর, সর্বত্র একই ছবি। সেগুলোর সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে প্রযোজনা করা দরকার। সেই পরিকাঠামোর আজ বড় অভাব। কিছু কিছু নতুন উন্নতমানের প্রযোজনা নিশ্চয়ই হচ্ছে, তবে সংখ্যাটা নেহাতই অল্প।

গ্রামবাংলার সংস্কৃতিতেও লেগেছে পরিবর্তনের ঢেউ। তারাও এখন অনেক বেশি ঝুঁকেছে বলিউডি ধাঁচের ধামাকা বা বিচিত্রা অনুষ্ঠানের মতো বিনোদনের দিকে। দর্শকদের রুচিও এখন নিম্নগামী। সেই চাহিদা মেটাতে গিয়ে ছবির জগৎ থেকে শিল্পীদের নিয়ে আসার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে হবে চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ আর যাত্রার অভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু ফিল্ম থেকে আসা অভিনেতারা অনেকেই যাত্রার উপযুক্ত অভিনয়শৈলীটি জানেন না। সেই জন্য চেষ্টা করেও বেশকিছু হাই বাজেটের নতুন প্রযোজনাও মার খাচ্ছে। এমনও দেখা গেছে যে, অপরিচিত অভিনেতা যাঁরা নিয়মিত যাত্রা করে থাকেন, তাঁদের দ্বারা অভিনীত এক-একটি পালা দশ বছরেও বেশি সময় ধরে চলেছে। আবার অন্যদিকে সিরিয়াল এবং ছায়াছবির জনপ্রিয় অভিনেতারা এসে যেসব পালায় কাজ করেছেন সেগুলো বছরখানেক চলার পর মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এখন প্রতি বছর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শীতকালে যাত্রা উৎসব আয়োজিত হচ্ছে। সেখানে কিন্তু অনেক যোগ্য এবং প্রবীণ মানুষ ব্রাত্য থেকে যাচ্ছেন, দোষটা সরকারের নয়, যাঁরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাঁদেরই। এখনও প্রত্যেক বছর পুরনো রীতি মেনে রথের দিন নতুন মরশুমের সূচনা হয়। বিজ্ঞাপনের দ্বারা নতুন পালা সম্পর্কে যাত্রাপ্রেমীদের অবহিত করা হয়। পথ চলতে সামনে আসবে আরও অনেক নতুন বিষয়, তাই যাত্রা-সম্পর্কিত অতীতের ইতিহাস, তথ্য ও যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জীবনধারা এবং কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করা যাবে অন্য কোনও অবসরে।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৫ মে ২০১৭

ঠাকুরবাড়ির মহিলা সম্পাদিকা

দোয়েল দত্ত

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি— নামটার মধ্যে যে মিথ লুকিয়ে রয়েছে দশকের পর দশক ধরে, সেরকম উন্মাদনা কলকাতার আর কোনও পরিবারকে ঘিরে আর কখনও বোধহয়-বা দেখা যায়নি। সেই রহস্য উন্মোচন করতে গবেষকরা আজও অন্বেষণরত। পুরুষদের পাশাপাশি সে-বাড়ির মহিলারাও শিক্ষা বা সংস্কৃতির আবহে যেমন বড় হয়েছিলেন, তেমনি স্বীয় দীপ্তির প্রকাশে অনেকেই নিজের চারপাশে গড়ে তুলেছিলেন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যপ্রতিভা বললে যে-নামটি সর্বপ্রথম মুখে আসে তা হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কিন্তু বিশ্বকবি ছাড়াও বাড়ির মেয়ে-বউদের অনেকেই মহিলা সম্পাদিকা হিসাবে তৎকালীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আসলে ঠাকুরবাড়ির এইসব মেয়ে-বউরা এমন এক পরিবেশ পেয়েছিলেন যেখানে অন্দরমহলের পরনিন্দা-পরচর্চার পাশাপাশি বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক বাতাবরণও ছিল। তাছাড়া তখন বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির জগতে ঘটে চলা নিরন্তর পরিবর্তনের ঢেউও তাঁদের গায়ে এসে পড়েছিল বই কি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এসকল মহিলা সম্পাদিকার দিকে দৃকপাত করলে আরও একটি সাদৃশ্য উঠে আসে ও তা হল তাঁরা প্রায় সকলেই পরিবারের সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলেই সেই অর্থে বাহিরমহলে প্রচার লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির মহিলা সম্পাদিকাদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা। ১৮৭৭ থেকে নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে হইহই করে শুরু হয় 'ভারতী' পত্রিকা। শুরুর সেদিনে স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীতে। পরবর্তীতে ক্রমশ তিনি এই পত্রিকার একজন সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠেন। বিকেলে তেতলার ছাদের বাগানে এই পত্রিকাকে ঘিরে বসত এক মজলিশি আসর। তার মধ্যমণি থাকতেন রবিঠাকুর, জ্যোতিদাদা আর স্বর্ণকুমারী। বিজ্ঞান বিষয়ে স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল। তাই তিনি চাইতেন 'ভারতী'র প্রতিটি সংখ্যাতেই যেন বিজ্ঞানের উপর একটি করে প্রবন্ধ থাকে। বিজ্ঞনের নানান জটিল, দুরূহ বিষয়গুলি কীভাবে সরল অথচ একইসঙ্গে সুখপাঠ্য করে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করে তোলা যায়, সে বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। সাল ১৮৮৪। নয় নয় করেও আট বছরের বালিকা হয়ে উঠল 'ভারতী', আর সে-বছরেই তার নতুন অভিভাবক তথা সম্পাদিকার দায়িত্ব বর্তাল স্বর্ণকুমারী দেবীর হাতে। এবং তারপরের ইতিহাসে তিনি স্বকীয় কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন।

সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম যে কাজটি তিনি দক্ষতার সঙ্গে সামলেছিলেন, তা হল তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগের সুবাদে সকলের কাছ থেকে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ আনতে শুরু করলেন। আর মহর্ষি-কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করার ধৃষ্টতা তো সেসময় ছিল সবারই স্বপ্নাতীত। 'ভারতী'তে কোন সংখ্যায় কী কী নতুন বিভাগ যোগ করা যায়, তা নিয়ে তিনি রীতিমতো যাকে বলে গবেষণা শুরু করে দিয়েছিলেন। বিদেশি সাহিত্যিকদের রচনার অনুবাদ অংশটির নাম দিয়েছিলেন 'বিদেশি ফুলের গুচ্ছ'। তাঁর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর কলমে উঠে এসেছে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা, 'ভারতী' হাতে নিয়ে মাকে কী অসীম পরিশ্রম করতে হত, ছোটগল্প, বড় গল্প, তা তো তিনি লিখেছেনই, হাস্য কৌতুক থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পর্যন্ত অনেক সময় তাঁকে নিজেকে লিখতে হত...।'

১৮৮৫ সাল ভারতীয় ইতিহাসে যেমন এক উল্লেখযোগ্য বছর, তেমনি ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসেও তা লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেসের সূচনায় উত্তাল, তেমনি ঠাকুরবাড়িতে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর সম্পাদনায় 'বালক' পত্রিকাকে ঘিরে চারিদিকে বেশ একটা হইচই, জমজমাট সাড়া পড়ে গেল। তবে বছরখানেক পরই 'ভারতী'-র সঙ্গে মিশে গেল 'বালক'। এর কিছুকাল পরে স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিকার পদ থেকে অবসর নিলেও ভাগ্যের লিখনে ১৯০৮ সালে দ্বিতীয়বার তাঁকে সম্পাদিকা হিসাবে ফিরে আসতে হয়। ১৮৯৪-তে সাময়িক বিরতিতে দুই কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা দায়িত্ব নিলেও ১৯০৮-এ রবির ন'দিদি যখন ফের দায়িত্ব নেন, তখন 'ভারতী'র অবস্থা আক্ষরিকই সংকটাপন্ন। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'ভারতী মহিলা' পত্রিকার পাশাপাশি অস্তিত্ব সংকটে ভোগা সন্তানকে বাঁচাতে পরম যত্নে এগিয়ে এলেন স্বর্ণকুমারী। দ্বিতীয় পর্যায়েও (১৯০৮-১৯১৪) স্বর্ণকুমারী দেবী বেশ দক্ষ হাতেই সম্পাদনাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময়ের অনেক নতুন প্রতিভাকেই তিনি 'ভারতী'তে তুলে এনেছিলেন। জ্যোতিদাদা, ভাই ভানু আর স্বামী জানকীনাথের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ছিল তাঁর সম্পাদনার মূল উৎস। আর তাকে পাথেয় করেই ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসের এই উজ্জ্বল সম্পাদিকা এগিয়ে গিয়েছেন স্বমহিমায়।

জোড়াসাঁকো মানেই বিতর্ক, বিস্ময়, প্রতিভা, আবার একইসঙ্গে প্রথাভাঙাও বটে। আর এই সবকটি বিশেষণ জ্ঞানদানন্দিনীর ক্ষেত্রে একইসঙ্গে প্রযোজ্য। ভারতের প্রথম আইসিএস সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী হয়ে তিনি যখন ঠাকুরবাড়িতে এলেন তখন তিনি নেহাতই একজন বালিকাবধূ। ক্রমশ স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্যে গড়ের মাঠে, ইংরেজদের দেওয়া পার্টিতে যাওয়া, একা একা জাহাজে করে বোম্বাই পাড়ি দেওয়া, সেখানে শাড়ি পরার বিদেশি ধাঁচ রপ্ত করা, কালাপানি পাড় করে সুদূর বিলেতে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করা— সব মিলিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী মানেই বিপ্লব। সেই জ্ঞানদা কলকাতায় ফিরে এসে ঠাকুরবাড়ির হেঁসেলে নিজেকে আটকে না রেখে সাহিত্যচর্চায় মন দেবেন সেটাই স্বাভাবিক। আর ঘটলও তাই। দেওর রবির উৎসাহেই ছোটদের জন্য লেখালিখির সূচনা। ভাবলেন, গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখার জন্য তো 'ভারতী' আছেই, বাড়ির ছোটদের কথা ভাবলে কীরকম হয়? যেমন ভাবা তেমন কাজ। যাবতীয় আত্মবিশ্বাস সম্বল করে ১৮৮৫-তে নিজের সম্পাদনায় শুরু করলেন 'বালক' পত্রিকা। ঠাকুর পরিবারের অনেক কচিকাঁচার লেখালিখির হাতেখড়ি এখান থেকেই, যার মধ্যে ছিলেন জ্ঞানদা-সত্যেন্দ্রর আপন কন্যা ইন্দিরাও। অবশ্য জ্ঞানদানন্দিনী সামাজিক ক্ষেত্রে যতই নিয়মনীতি বা ঠুনকো প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করুন না কেন, ব্যক্তিজীবনে কিছুটা হলেও তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাই মাত্র একটি রচনাতেই থেমে ছিল তাঁর লেখনি। তবে শুধু লেখা নয়, শিশুমননের উৎসাহ বুঝে তিনি একটি লিথোপ্রেস স্থাপন করেছিলেন, যার খরচ পুরোটাই বহন করেছিলেন নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে। সম্পাদনার প্রতিটি কাজেই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরশ।

এবারে আসা যাক রবির আলোর পরশের পরবর্তী ধারায়, মানে রবিঠাকুরের পরবর্তী প্রজন্মের সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাসুন্দরীর কথা। ছোট থেকেই গানের প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল প্রতিভার। মেয়েকে সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে পিতা হেমেন্দ্র যেমন তাঁকে যোগ্য সংগত দিয়েছিলেন, তেমনি দাদামশায় মানে খোদ মহর্ষিও প্রতিভার এই সংগীতপ্রতিভা নিয়ে বেশ গর্ব করতেন। জেঠিমা জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহেই তাঁর 'বালক' পত্রিকাতে সাংকেতিক স্বরলিপি প্রথম লিখেছিলেন প্রতিভাসুন্দরী। সংগীতে জোড়াসাঁকোর আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর উৎসাহে 'সংগীত প্রকাশিকা' নামে এক পত্রিকা বের হলেও তা ছিল বড়ই স্বল্পায়ু, পরে প্রতিভা স্বীয় উদ্যোগে শুরু করেন 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'। এই পত্রিকা প্রকাশনায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন সত্যেন্দ্র কন্যা ইন্দিরা। টানা আট বছর ধরে এই পত্রিকাটি ঠাকুরবাড়ির অন্তরমহল থেকে বের হয়ে এসেছিল। গানের স্বরলিপির পাশাপাশি, অনেক পুরনো হারিয়ে যাওয়া গানও এই পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত হয়েছিল। পাশাপাশি তানসেন থেকে বৈজুবাওরা— এরকম অসংখ্য সংগীতশিল্পীর জীবনী ছাপা হয়েছিল। সংগীত নিয়ে প্রতিভাসুন্দরী যে আক্ষরিকই এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার সাক্ষর বহন করতেন, এই পত্রিকার প্রতিটি ছত্রে তার প্রমাণ মেলে।

হেমেন্দ্রনাথের আরেক গুণী কন্যা ছিলেন প্রজ্ঞাসুন্দরী, সম্পর্কে প্রতিভাসুন্দরীর মেজোবোন। ঠাকুরবাড়ির কন্যাদের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ ছিল— এঁরা বেশিরভাগই ছিলেন রন্ধনপটিয়সী। আর হেমেন্দ্রনাথের রক্ত যাঁর ধমনিতে তিনিই-বা এর ব্যতিক্রম হবেন কী করে? প্রজ্ঞাও খুব ভালো রান্না করতে পারতেন। রান্নায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন খুব ছোটবেলা থেকেই, তার উপর অসমের প্রখ্যাত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার সঙ্গে সুখী দাম্পত্য— সব মিলিয়ে প্রজ্ঞা আরও বেশি করে রন্ধন শিল্পে আত্মনিয়োগ করলেন। আমিষ থেকে নিরামিশ সমস্ত পদেই তিনি তাঁর নিপুণ হাতের জাদুতে করে তুলতেন অভাবনীয় সব পদ। এহেন প্রজ্ঞা পরে রন্ধনপ্রণালি নিয়ে একটি বইও লিখেছিলেন। তবে আমাদের আজকের আলোচ্য সাময়িক বা মাসিক পত্র। পিতা হেমেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উৎসাহে প্রজ্ঞাসুন্দরী ঠাকুরবাড়িতে অবস্থানকালে 'পুণ্য' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। প্রজ্ঞা যে পত্রিকার সম্পাদিকা সেখানে রন্ধনের বিষয়টিকে যে অধিকতর গুরুত্ব সহযোগে প্রকাশ করা হবে, সে নতুন কথা কী। আমিষ ও নিরামিশ দুই রকমেরই পদের কত বিচিত্র রন্ধনপ্রণালি যে সেখানে আলোচনা হতো, তা বলে শেষ করার নয়। প্রজ্ঞার আরও একটি বড় দখল ছিল তিনি একটির পর একটি পরিভাষা রচনা করেছেন। এভাবে তিনি রন্ধনশিল্পে সেই 'পুণ্য' পত্রিকার মাধ্যমে প্রচুর পরিভাষার জন্ম দিয়েছিলেন। ফোড়ন, বাজারদর সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি দিয়ে রন্ধনপ্রণালির পাশাপাশি তিনি পুণ্যর রন্ধন বিভাগটিকে বারে বারেই অভিনবত্ব দেওয়ার চেষ্টা করতেন, যা আধুনিক ম্যাগাজিনগুলোর কাছেও নিঃসন্দেহে একটা দৃষ্টান্ত অনায়াসেই হতে পারে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা ও হিরণ্ময়ী দেবী 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, তার উল্লেখ ইতিপূর্বেই আমরা করেছি। সম্পাদিকা হিসাবে সরলার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল মায়ের মতোই নব্য প্রতিভাদের বাছাই করা। জহুরীর চোখ ছিল বটে তাঁর। তখনকার অনেক অনামী লেখকই 'ভারতী'তে লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন পরবর্তীতে। আবার গুণী লেখকদের অন্বেষণেও সদাব্রতী থাকতেন সরলা—একসঙ্গে দুটি কাজই সামালতেন সুনিপুণ পরিচালনায়। তাঁর সময়েই নানান ইংরেজি প্রবন্ধের বাংলায় তর্জমা করে 'ভারতী'তে ছাপা হয়েছিল। সম্পাদিকা হিসাবেও বহু বিচিত্র বিষয় প্রকাশ পেত তাঁর লেখনির মুনশিয়ানায়। গল্প-উপন্যাস, রম্যরচনা, অনুবাদ, সমালোচনা নানান লেখা তাঁকে লিখতে হতো, সংস্কৃত থেকেও তিনি প্রচুর অনুবাদ করেছিলেন। 'ভারতী'-র সম্পাদনার সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দ সরলার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সুযোগ হয়েছিল নিবেদিতার সঙ্গেও ব্যক্তিগত পরিচয় গড়ে তোলার। স্বামীজি সরলার ব্যক্তিগত ভাবধারায় এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর প্রকাণ্ড কর্মযজ্ঞে সরলাকে সামিল করতে চেয়েছিলেন।

এছাড়াও ঠাকুরবাড়ির আরও এক ক্ষুরধার মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন হেমলতা, যিনি

জ্ঞানদানন্দিনীদেবী

সম্পাদনা করেছিলেন 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা। হেমলতা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কবিতা রচনাতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আরও একটি গুণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গানের তিনি সুরও দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্বরলিপি যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে আজ কালের কড়াল গ্রাসে বিলীন।

ঠাকুরবাড়ির মহিলা সম্পাদিকা বা প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে স্বল্প পরিসরে কখনওই লেখনির বৃত্তকে সম্পূর্ণ করা যাবে না। উপরে যেসব প্রতিভাকে নিয়ে আলোচনা করা হল, তার বাইরে অনেকেই বাকি থেকে গেলেন। পরে অন্য কোনও দিন, অন্য কোনও অবসরে সে প্রসঙ্গে কলম ধরার অবকাশ হলে সেসব নিয়ে আরও বিশদে আলোচনা করা যাবে।

সরলাদেবী

স্বর্ণকুমারীদেবী

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৫ মে ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

কী এক অদ্ভুত মাদকতা আছে কলকাতায়...

সঈদ আলম বাবুল (অধ্যাপক ও গবেষক)

প্রত্যেকেরই প্রিয় কিছু শহর থাকে। আমারও আছে। সেই শহরগুলোর নাম যদি পরপর বলতে বলা হয় তবে ঢাকার পরে যেটি আমার সবচেয়ে প্রিয় শহর, সেটি কলকাতা। ছোটবেলায় অনেক গল্প শুনেছি কলকাতার। তাই কলকাতাকে কাছ থেকে দেখাবার সাধ ছিল অনেকদিনের। এই সাধ পূরণ হল ২০১২ সালে। নিছকই বেড়াতে নয়, একটা কাজেই গিয়েছিলাম। গবেষণার কাজে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যেতে হয়েছিল। তাই সেবার স্বপ্নের শহরটাতে দু'দিন কাটিয়ে যাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। আসলে আমার ধারণা যা ছিল চাক্ষুষ দর্শনে দেখলাম কলকাতা তাঁর চেয়েও বেশি কিছু। অপরূপ, মায়াবী।

শিয়ালদাতে এসে যখন প্রথমদিন সন্ধ্যায় পৌঁছলাম সেদিন ছিল একটা প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির দিন। আমি আর প্রোফেসর আলি (মইনুর আলি) একটা হোটেল নিলাম রাজাবাজারের কাছে। রাতে ডিনারের পর আলি সাহেব বললেন, 'চলো বাবুল বৃষ্টিটা ছাড়সে। এইবার একটু শহরডা ঘুইর‍্যা আসি।' দু'জনে মিলে বেরোলাম। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির পর একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ। ট্রেন থেকে নামার পর যে যানজটময় কলকাতা দেখেছিলাম এ কলকাতা একেবারে ভিন্ন। স্ট্রিটলাইটগুলো যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে বদলে যাওয়া কলকাতার রং-রূপকে। আমরা তখনও হাঁটছি সামনের দিকে, সামনে কোনও রাস্তা জানা নেই। তবু হাঁটছি, ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। কী এক অদ্ভুত মাদকতা আছে শহর কলকাতায় যা আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

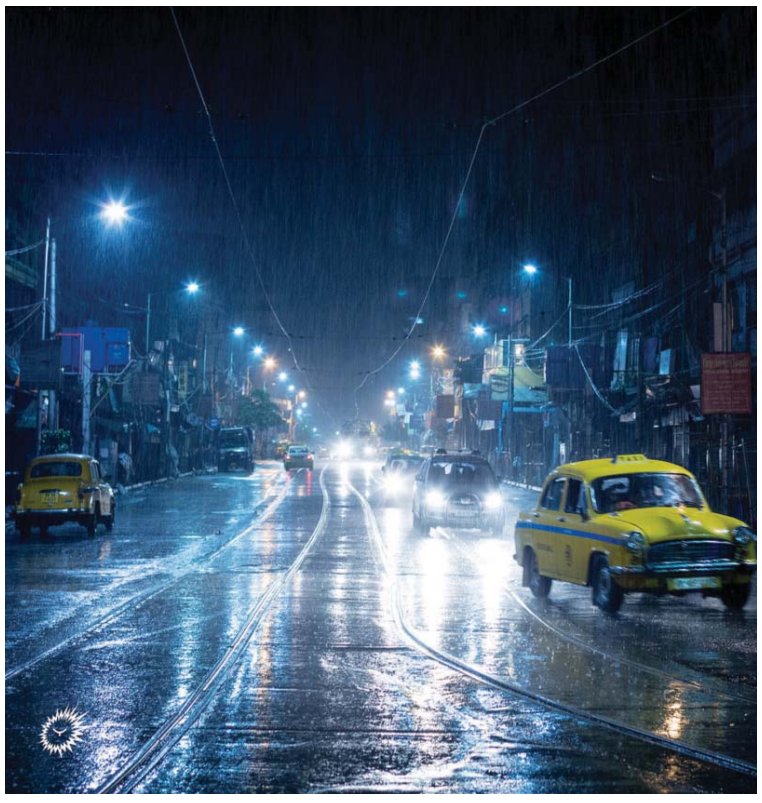

একজনকে জিজ্ঞেস করতে জানতে পারলাম আমরা কলেজ স্ট্রিটে এসে পৌঁছেছি। দোকানপাট ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকারের আলোয় প্রথমবার দেখলাম বইয়ে পড়া, গল্পে শোনা কলেজ স্ট্রিটকে।

পরদিন বীরভূম গেলাম। কাজ মিটিয়ে (যে সেমিনারে যোগ দিতে আসা, সেটি হয়ে যাওয়ার পর) পরেরদিন কলকাতা ফিরলাম আবার। কলকাতায় তেমন পরিচিত কেউ নেই। আমরা দু'জন। তবু ঘোরার ইচ্ছে প্রবল। দু'দিনের যে সময়টুকু পেয়েছি পুরোপুরি উপভোগ করার চেষ্টা করেছি। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের কাছে একটা হোটেল নিলাম দু'দিন থাকব বলে। ধর্মতলা চত্বরটা সারাদিন যেমন জমজমাট ঠিক তেমনি শান্ত প্রিন্সেপ ঘাটের পরিবেশ। গঙ্গার পাড় অপরূপ। আহ! সে কী অদ্ভুত আমেজ সে মুহূর্তগুলোর।

প্রথম কলকাতা দেখা শুরু করলাম ভিক্টোরিয়া আর বিড়লা তারামণ্ডল দিয়ে। তারপর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। একে একে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, সায়েন্স সিটি। মোটামুটি দু'দিনে যতদূর ঘোরা সম্ভব। তবে বেশ নতুন খাবার-দাবারও খেয়েছিয়াম কলকাতায় গিয়ে। শ্যামবাজার-এর মিত্রর দোকানের ফিশ কবিরাজি, গোলবাড়ির মাংস, মিষ্টি। ওই দুটো দিন যে কীভাবে কেটেছে নিজেই জানি না। শুধু মনে হচ্ছিল দিনের দৈর্ঘ্যটা আর একটু বড় হলে বোধ হয় ভালো হতো।

আসলে কলকাতা এমন একটা শহর যা সবাইকে খুব সহজেই আপন করে নেয়। আমাদেরও নিয়েছিল। মানুষের ব্যবহার থেকে পুলিশের সহযোগিতা সত্যিই কলকাতা অনেক আন্তরিক। অনেক পুরাতনের সাক্ষী অনেক নবীনের পৃষ্ঠপোষক এই শহরের রাস্তাঘাট, মানুষজনকে অল্প সময়েই খুব আপন লেগেছে। তবে একটা জিনিস যেটা ভালো লাগেনি সেটা হল ফুটপাথের ধারে থাকা মানুষগুলোকে দেখে। খুব কষ্ট লেগেছে। তবে যাই হোক এই শহরকে ঘিরে আবেগ আছে, থাকবে। এ ভালোবাসা, ভালোলাগা চিরকালীন। কলকাতার আরও অনেক জায়গার গল্প শুনেছি অল্প সময়ে যেতে পারিনি ঠিকই, তবে কলকাতাতে পরে যখন যাব সেই জায়গাগুলো দেখার সাধ আগে পূরণ করব। ভালো থাক প্রাণের কলকাতা, ভালো থাক তার সাথে জুড়ে থাকা প্রতিটা মানুষ।

বরিশালের জহর

শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়

কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রুফ রিডিং কখনও দর্জির দোকানে কাজের ফাঁকেই সময় চুরি করে চলেছে অভিনয়চর্চা। সালটা ১৯৪৬, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পূর্বরাগ' ছবির মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন তিনি। তারপর আপামর বাঙালি দর্শককে একে একে উপহার দিয়েছেন 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'উপহার', 'পরশপাথর', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'পলাতক', 'সুবর্ণরেখা', 'ধন্যি মেয়ে'— একের পর এক কালজয়ী ছবি। বাংলার সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে যা আজও মাইলস্টোন হয়ে আছে। বিমল রায়ের 'অঞ্জনগড়' ছবিতে তাঁর প্রথম বড় ভূমিকা লাভ। মূলত তিনি বাংলা ছায়াছবির এক কিংবদন্তি কৌতুক অভিনেতা। রুপোলি পর্দায় যার উপস্থিতি মানেই এক দম ফাটানো হাসির ঝিলিক। কে বলুন তো তিনি? হ্যাঁ, তিনিই কিংবদন্তি কৌতুক অভিনেতা জহর রায়।

১৯ সেপ্টেম্বর,১৯১৯-এ জন্ম। আদি বাড়ি ওপার বাংলার বরিশালে। বাবার নাম সতু রায়। তিনিও অভিনেতা হিসাবে রঙ্গমঞ্চ ও

চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রুপোলি পর্দার জীবন শুরু করার আগে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই ছিল তাঁর জীবন। ১৯৩৮ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন নারকেলডাঙা জর্জ হাইস্কুল থেকে। তারপর পাটনা থেকে আইএ পাস করে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রুফ রিডিং-এর কাজ করতেন। পরে সেখানেই একটি দর্জির দোকানও করেছিলেন। এসব কাজের ফাঁকেই তিনি চালিয়ে গেছেন তাঁর অভিনয়চর্চা। কলকাতায় আসেন ১৯৪৬-এ। প্রথম ছবি পূর্বরাগ'।

বেশিরভাগ বাংলা ছবিতেই একদিকে নায়ক-নায়িকার রোম্যান্টিক প্রেম, অন্যদিকে দুরন্ত মারদাঙ্গা-অ্যাকশন বা যে কোনও নাচগানের দৃশ্য, এর মাঝখানে তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির পরিসর ছিল ছোট। কিন্তু তাঁর অভিনয়ের গুণেই ওই ছোট্ট ছোট্ট চরিত্রগুলো আজীবন দর্শকদের মনে দাগ কেটে যায়। অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনি দর্শকদের হাসিয়েছেন দীর্ঘদিন। বিমল রায়ের 'অঞ্জনগড়' ছবিতে তিনি প্রথম বড় রোলে অভিনয় করেন। এরপর তিনি কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের মতো পরিচালকদের সঙ্গেও। সত্যজিৎ রায়ের 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে জহর রায়কে দেখা গেছে হাল্লার ষড়যন্ত্রকারী মন্ত্রীর ভূমিকায়। তাঁকে সমালোচকদের বাহবাও দিয়েছে। এই ছবিতে তিনি প্লে ব্যাকও গেয়েছেন।

কৌতুক অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে করেছেন প্রায় শতাধিক ছবি। এই জুটির বিখ্যাত ছবিগুলি হল 'পাসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'এ জহর সে জহর নয়', 'ভানু পেল লটারি', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', 'রাজকুমারী', 'আশিতে আসিও না' ইত্যাদি।

সিনেমার পাশাপাশি তিনি একইরকম দাপিয়ে অভিনয় করেছেন মঞ্চ নাটকেও। ১৯৫৩ সালে নিয়মিত শিল্পী হিসাবে যোগদান করেন রংমহল নাট্যমঞ্চে। পরে সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পরিচালিত শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষে ওই মঞ্চ ভাড়া নিয়ে নাটক-নির্দেশনা শুরু করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রংমহল থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এককভাবে এবং অজিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে অনেক কৌতুক রেকর্ড করেছেন।

কৌতুকশিল্পী হিসাবে তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয়তা থাকলেও তিনি ছিলেন সার্থক চরিত্রাভিনেতা। নিখুঁত ও অবিস্মরণীয় অভিনয়ে তিনি যে কোনও চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারতেন।